আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষবরণ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩১

বসন্ত শেষ হল না, এখনই গরমের দাবদাহের যেন শেষ নেই। সকাল থেকেই দারুণ গরমের ছ্যাঁকায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। বারবার স্নান করেও যেন আশ মেটে না। তা-ও এখনো বছর শেষ হয়নি। পয়লা বৈশাখ আসি আসি করছে। তার ওপর সামনেই ঈদ। সব মিলিয়ে যত যা-ই হোক বাঙালির উৎসবের মুহূর্ত তো বটেই, বাংলা পুরনো বছরকে পেছনে ফেলে নতুন করে সেজে ওঠার দিনও বটে।বছরের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলার : সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। আনন্দে থাকুন।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

ইশা ফাউন্ডেশনের তরফে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং সদ্গুরু সম্প্রতি ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন যে, দেশে নাকি সমস্ত মানুষই অর্থনৈতিক স্বস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এবং তাঁরা আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন সমাজের উন্নয়নের পথে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে চলার মধ্যে থেকে।

লোকসভা ভোট সামনেই। আর এই মাস থেকেই বেড়ে গেল লিকুইড অক্সিজেন, স্টেরয়েড, পেইনকিলার, বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সহ এমনকি প্রেশার, সুগার , কোলেস্টেরল, সর্দি কাশি জ্বর ইত্যাদির ৭২৬ থেকে ৮০০ রকম সাধারণ ওষুধের দাম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন শোনা যাচ্ছে গত বছরগুলির তুলনায় এই বৃদ্ধির হার নাকি সামান্যই। কিন্তু লাইফসেভিং ড্রাগের দাম আচমকা এইভাবে বাড়িয়ে দেওয়ায় চাপ পড়বে অবশ্যই সাধারণ মানুষের উপর, যা নিয়ে চিন্তিত দেখা যাচ্ছে না রাজনৈতিক মহলকে। অথচ মনে রাখতে হবে আগের দুই অর্থবর্ষে যথাক্রমে ১০ এবং ১২ শতাংশ হারে এইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের দাম কিন্তু বেড়েছে, যার দরুন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে মধ্যবিত্ত কেবল নয় , এক শ্রেণির উচ্চবিত্তের কপালেও। সেক্ষেত্রে এই যে বলা হচ্ছে এবারের মূল্যবৃদ্ধির হার কেন্দ্রের ‘সাফল্য’ –এরই লক্ষণ, তাতে কতটা আশ্বস্ত হতে পারছেন সাধারণ ভুক্তভোগীরা তা নিয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্টই। কারণ এবারের এই বৃদ্ধি পাওয়া দামের ওষুধের মধ্যে আছে এমনকি উচ্চ রক্তচাপ আর ডায়াবেটিসের প্রায় ৬৯টি ওষুধও, যে অসুখগুলিতে আক্রান্ত রোগীকে এই ওষুধ সারা বছর খেয়ে যেতে হয় এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের ভবিষ্যতেও খেয়ে যেতে হবে। এই পরিস্থিতিতে, সদ্গুরু এবং তাঁর অনুগামীরা যতই আশ্বাস দিন না কেন, তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়াই স্বাভাবিক।এবং অচিরেই যদি এই অবস্থার বদল না হয় তাহলে সে ভাঁজ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্যও ; সদ্গুরুরা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়েও সে ভাঁজ কতটা মুছতে পারবেন তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সূচিপত্র

লোকসভা ভোট ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনার পারদ Page 5
স্বপন দে সরকার

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (দ্বিতীয় পর্ব) Page 8
আদিত্য ঠাকুর

ফিরে দেখা (দ্বিতীয় পর্ব) Page 11
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

পহেলা বৈশাখ, এসো এসো Page 16
দিবাকর দাস

রঙে রেখায় রাজপুতানা (দ্বিতীয় পর্ব) Page 18
আদিত্য সেন

সাবধান হোন গরমে Page 24
অলক দে

বাড়ছে বায়ু দূষণ Page 26
দেবেশ দত্ত

নামিবিয়া-বোৎসোয়ানা-জিম্বাবুয়ে-ভিক্টোরিয়া ফলস্ ভ্রমণ (প্রথম পর্ব) Page 28
শিবাশিস চক্রবর্তী

হ্যালো, কক্সবাজার Page 32
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (দ্বিতীয় পর্ব) Page 36
বাবলু সাহা

ইউরোপের ডায়েরি (তৃতীয় পর্ব) Page 39
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

কম উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে না আই পি এল Page 46
শঙ্খশুভ্র ঘোষ

'অতি উত্তম' হইল Page 48
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

অন্য জগৎ Page 50
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

লোকসভা ভোট ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনার পারদ

স্বপন দে সরকার

সম্প্রতি কোচবিহারের জনসভা থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর তরফে তাঁর নিজের জমানায় গত দশ বছরে দেশের যা চেহারা দাঁড়িয়েছে তা স্রেফ ট্রেলার , আসল ছবি এখনো বাকি বলে জানান দেবার পর স্বভাবতই কেবল রাজ্য নয় সারা দেশ জুড়েই হইচই পড়ে গেছে। তাঁর দাবি, আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও কঠোর হবে। একজন অপরাধীও আর জেলের বাইরে থাকবে না। স্বভাবতই এই দাবির বিরুদ্ধে বিরোধীরা তোপ দেগেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। সম্প্রতি আবগারি দুর্নীতি মামলায় ধরা পড়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং। তারপর থেকেই খোদ রাজধানীর রাজনৈতিক আবহাওয়াও যথেষ্ট গরম। বিরোধীরা স্পষ্টই বলছেন, ফের ক্ষমতায় এলে বিরোধী নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহারের প্রবণতা নিয়ে তাঁরা সবিশেষ আতঙ্কিত। তাঁদের বক্তব্য খোদ কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় থাকা দল নিজেই যেখানে নির্বাচনী বন্ড কেলেংকারিতে বিদ্ধ সেখানে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলা প্রধানমন্ত্রীর আদৌ সাজে না। তার ওপর লোকসভা ভোটের ঠিক

আগেই আয়কর দফতরের তরফে কংগ্রেসকে ১৮২৩ কোটি টাকার নোটিশ ধরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে কী ভাবে কর সন্ত্রাস চালিয়ে তারা বিরোধী শিবিরকে বুলডোজিং করতে বদ্ধপরিকর। তাদের অভিযোগ প্রথমে কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩৫ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে এবং তার পরেই ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ এবং ১৯৯৩-৯৪ এর জন্য ১৮২৩ কোটির আয়কর দাবির নোটিশ পাঠানো দিয়েই সরকার তথা কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে তারা কোনোভাবেই প্রতিপক্ষকে ঠান্ডা মাথায় ভোট যুদ্ধের মোকাবিলা করার সুযোগ দিতে রাজি নয়। এই পরিস্থিতিতে অপারেশন লোটাসের ছকে আপ বিধায়কদের কাউকে দর বুঝে ২৫ কাউকে আবার ৫ কোটির অফার দেওয়া নিয়েও কম জল ঘোলা শুরু হয়নি। বিজেপি যতই বলুক এ সবই ষড়যন্ত্র , তবু সবাই যা রটে তার কিছু তো ঘটে ছকে বিষয়টিকে দেখতে শুরু করে দিয়েছেন বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের কাছে খবর। এবং এই পরিস্থিতিতে অবস্থা সামাল দিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে নামতে হয়েছে আসরে। বলতে হয়েছে যারা আজ ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে উল্লাস করছে তাদের পরে অনুশোচনা করতে হবে। তাঁর দাবি নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু

করেছিলেন তাঁরা । এবং সামান্য সাহসের সঙ্গেই বলতে সোনা যাচ্ছে যে, এই জন্যেই তো এখন সব জানা গেল। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিরোধীদের একাংশের প্রশ্ন : কী জানা যাওয়ার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ! বললেনই যদি তাহলে বন্ডের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী জমা দিতে খোদ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও টালবাহানা করছিল কেন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক !

অন্য দিকে তাঁদের বক্তব্য : ৪ লক্ষ কোটি তাকার কন্ট্র্যাক্ট, প্রজেক্ট ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের সঙ্গে এই বণ্ডের যোগ ঘনিষ্ঠ।

এমতাবস্থায় জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর দেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত আর্থিক অপরাধের মোকাবিলাকে লক্ষ্যে রেখে সিবি আই রাইজিং ডে-তে ২০ তম ডিপি কোহলি মেমোরিয়াল লেকচার উপলক্ষ্যে মূল বক্তার আসন থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় যে তোপ দেগেছিলেন দেশের সেরা তদন্তকারী সংস্থাকে কার্যত বহুব্যবহারে ভোঁতা করে দেবার অভিযোগে , তাও সামনে উঠে আসছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের মত। এইসব কিছুর প্রেক্ষিতেই গত দশ বছরের কার্যকলাপকে ট্রেলার অভিধায় অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী কোন ইঙ্গিত দিতে চাইলেন তা-ই নিয়েই আপাতত তোলপাড় রাজনৈতিক মহল।

লেখা ২

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (দ্বিতীয় পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

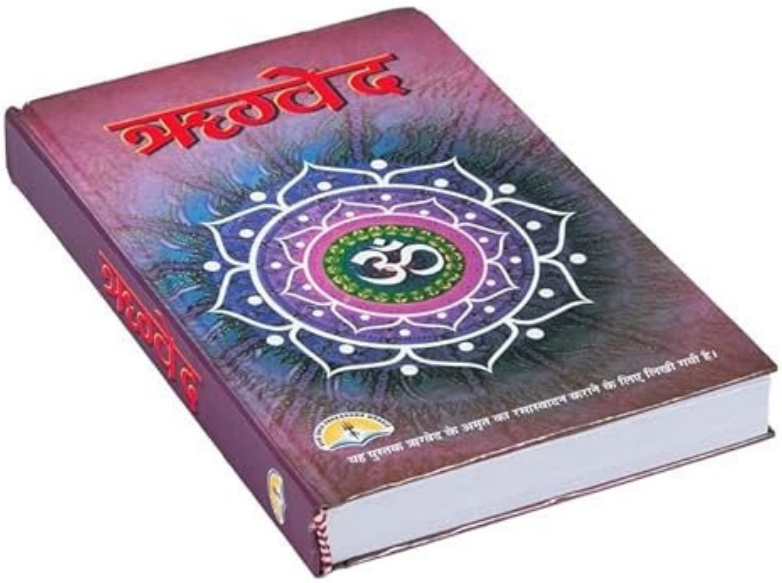

তাঁরা দেব-দেবীর পুজার দিন নির্দিষ্ট করেছেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই দিন নির্দিষ্ট থাকে। বেদ হোক, স্মৃতি হোক, পুরাণই হোক, কারণ বিনা ধর্মকৃত্যের দিন নির্ধারিত হয়নি। আমরা হেতু না জানতে পারি কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হওয়ার উপায় নেই। কোনও পণ্ডিত বা বিদ্বান ইচ্ছে করলেই তাঁর ইচ্ছামত যজ্ঞ বা পূজা করা হত না। কোনও এক বিদ্বান বললেন আজ অমুক যজ্ঞ করা হোক, বা এসো আজ অমুক পূজা করি। সকলে তা মানবে না, যজ্ঞ বা পূজা করবে না। যজ্ঞের হেতু কী অথবা পূজার কারণ না জানালে পূজা হবে না। এই প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে, যজ্ঞের বা পূজা অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট হতে পারত না, বেদের কালেও না, পুরাণের কালেও না।

পুরাণকার দেব-দেবীর নানা উপাখ্যান রচনা করলেও প্রতিমা কল্পনায় গুরুপরম্পরা মেনে চলতেন। সরস্বতী বিদ্যার প্রতীক তাই সরস্বতীর হাতে বই বীণা দেখা যায়।

অপ্সরার হাতেও বীণা থাকতে পারে, কিন্তু পুস্তক থাকে না। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সরস্বতী বন্দনায় লিখেছিলেন, "শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেত বস্ত্র পরিধান" , "শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে জপমালা, শুকশিশু শোভে বাম করে।" তাঁর এক হাতে পুস্তক, মসীপত্র (কালির দোয়াত) ও লেখনী তাঁর সঙ্গী। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী, বেনুবীণা, নানা বাদ্যযন্ত্র নিরন্তর তাঁর সেবা করে। তিনি বিধিমুখে বেদধ্বনি, বীণাপাণি, বর্ণময়ী, বিষ্ণুমায়া। দেখা যাচ্ছে কবিকঙ্কণের সরস্বতী চতুর্ভূজা, ডান হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও মসীপাত্র। বাম হস্তদ্বয়ে জপমালা ও শুকশিশু। শুকশিশু লীলাশুক। "শিরে শোভে ইন্দুকলা" – শুক্ল পঞ্চমীর চাঁদের কলা, সরস্বতী প্রতিমার মুকুটের লক্ষ্মণ। বিষ্ণুমায়া আদ্যাপ্রকৃতি। লীলাশুক প্রকৃতির লীলা বুঝাচ্ছে। দুর্গা মহামায়া মহাশক্তি, সরস্বতী সে শক্তির একাংশ।

আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি ছাড়াও উত্তর গোলার্ধে অপর একটি গ্যালাক্সি দেখতে পাই। মীনরাশির অহির্ব্রধ্ন বা উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের দিকে তাকালে আমরা অ্যান্ড্রোমিডার কুণ্ডলী আকারের গ্যালাক্সি (Andromedae: Spiral shaped Galaxy) অন্য একটি ছায়াপথের মতো দেখতে পাবো। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসের প্রায় মধ্য আকাশে নির্মেঘ রাত্রিতে কোটি কোটি তারকা সমন্বিত আকাশগঙ্গাকে আমরা উজ্জ্বল আলোর মেঘমালার মতো উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত প্রবাহমান দেখতে পাই। বছরের অন্য সময়ও এই ছায়াপথের দেখা মেলে কিছু উত্তরে বা দক্ষিণে হেলানো অবস্থায়।

ঋগ্বেদের ঋষিরা ছায়াপথের তথ্যগুলি কিছুই প্রায় জানতেন না – কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলিকে শুধুমাত্র দূরের মেঘমালা বলেও ভাবেন নি। তাঁদের প্রতিদিনের আকাশ পর্যবেক্ষণের কিছু গভীর মননের কথা শুনতে পাই ঋকে –

<u>ঋগ্বেদ ১|৮৩|৫</u>

"যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্তে ততঃ সূর্য্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে।।"

অনুবাদ – "সক্রিয় অব্যক্ত তেজ হতে প্রথম জ্যোতিপথ প্রস্তুত হল, অতঃপর ব্রতপরায়ণ কালাগ্নিকান্তি সূর্যের গতি সঞ্চারিত হল। আজ যিনি প্রত্যক্ষ – এই দিবাকরের দাক্ষিণ্যে সৃষ্টির সূচনা, জন্ম-মৃত্যুর ও কালের কারকতা প্রবাহিত হল।"

আবার দেখা যায়,

<u>ঋগ্বেদ, ১|৮৫|২ –এ</u>

“ত উষ্ণিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধিচক্রিরে সদঃ।
অর্ষন্ত অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়ম্ অধিশ্রিয়ো দধিরে পৃশ্নিমাতরঃ।।”

অনুবাদ – “রুদ্রতেজের পরিব্যাপ্তিতে নভোমণ্ডল চক্রাকারে অধিকৃত, তেজ সিঞ্চনে অর্চনীয় অর্কের (সূর্যের) সৃষ্টি হয়েছে ও (অর্ক) সদনস্থ রয়েছেন। পার্থিব মানব ইন্দ্রিয়বর্গের অধিকৃত ক্ষমতায় তা ধারণা করে।”

প্রাচীন কালে ছায়াপথকে নীহারিকাও বলা হত, বর্তমানে নীহারিকার (Nebula) অর্থ ভিন্ন। সেই নীহারিকার তেজ প্রবাহে সূর্যের জন্ম এবং সূর্যের প্রসাদে পার্থিব জীবনের ধারা প্রবাহিত, এই চিন্তায় ঋগ্বেদের কালের বিজ্ঞানমনস্কতার কিছু আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়।

শ্রবণা নক্ষত্র মকর রাশির অন্তর্ভুক্ত। মকর রাশিতে সূর্য অবস্থান করে মাঘ মাসে। চান্দ্র মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা বিহিত আছে। শ্রবণার অধিপতি বিষ্ণু। শ্রবণা নক্ষত্র ছায়াপথের যে অংশে অবস্থান করছে, মাঘমাসে সূর্য ছায়াপথের সেই অঞ্চল পেড়িয়ে আসে। সূর্যের অতিক্রম করা সেই অঞ্চলই বিষ্ণুগঙ্গা।

এর পর আগামী সংখ্যায়

ফিরে দেখা (দ্বিতীয় পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

একসময়ে অর্থাৎ আমার খুব ছোটবেলায় ঘরের একেবারে কাছেই ছিল বেহালার অন্যতম পুরাতন সিনেমাহল ' সুচিত্রা '। ফলে, বহু ভালো ভালো বাংলা-হিন্দী এবং ইংরেজি মুভি আমি এই হলে দেখেছি (বাবার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে একাই চলে যেতাম দেখতে)।

তারমধ্যে কয়েকটি চলচ্চিত্রের নাম না বললেই নয়।

যেমন : বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাশ্বেতা, ৮০ তে আসিও না, ভানু পেলো লটারী, হিন্দীতে হাতি মেরে সাথী, ইংরেজিতে গানস অফ নভারোন, টোয়েন্টি থাউস্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সী, হাতারি । আসলে পরবর্তীকালে ফরিয়াদ, চৌরঙ্গী, মহানায়ক উত্তমকুমারের বহু কালজয়ী সিনেমা।

আসলে, বয়সের কারণে অনেক বিখ্যাত সিনেমার নাম (সুচিত্রা হলে দেখা) এখন আর স্মরণ করতে পারি না। এবং, তখনকার সিনেমা দেখানোর প্রসঙ্গ এলেই, সিনেমা সংক্রান্ত বিষয়গুলি এক এক করে বলতেই হয়। যেমন, তখন ছোট বয়েস থেকেই আমাদের লক্ষ্য থাকত ৩৭ পয়সার ফ্রন্ট স্টলের টিকিট।

যদিও অনেকসময় বাবার আগে থাকতে কেটে রেখে দেওয়া টিকিটে অনেক সিনেমা তখনকার ব্যালকনিতে বসে দেখেছি। কিন্তু হাতে কোনভাবে পয়সা পেলেই, ওই ৩৭ পয়সার টিকিট।

তখনকার এই ৩৭পয়সার টিকিট নিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি সিনেমা হলের গল্পটি মোটামুটি একই।

বিশেষ করে ম্যাটিনি এবং ইভিনিং শো এ। যে কোনও বাজার চলতি হিট বা সুপারহিট সিনেমা হলে, মূল শো শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বন্ধ গেটের সামনে লম্বা লাইন দিতে হত।

আর, সেসব লাইনে সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজের ক্লাস কাটা ছেলে-ছোকরার দল, এলাকার উঠতি মাস্তান দাদা এদেরই দল ভারী ছিল। আর ছিল লাইন সামলানোর জন্য তেল চকচকে বাঁশের লাঠি হাতে দশাসই গাট্টাগোট্টা গোঁফ পাকানো বিহারী দারোয়ান। লাইনে কোনও রকম গন্ডগোল (যা একেবারে অবশ্যম্ভাবী ছিল) হলেই, চওড়া হাতের রামধাক্কা আর ওই লাঠির বাড়ি।

সেই অবস্থায় একটি টিকিট মেলা মানে, হাতে চাঁদ পাওয়া।

৩৭ পয়সার গ্যালারি পরে যথাক্রমে হয়েছিল ৬০-৭৫-৯০-১,১০ এবং ১,২৫ পয়সা।

কেন এই গ্যালারিকে কেন্দ্র করে আলাদা-আলাদা হলের আলাদাভাবে এত শত গল্প - কাহিনী, সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদে এক-এক করে আসব।

তার আগে, সুচিত্রা হলের ভিতর এবং বাইরের অন্যান্য কাহিনিগুলি বলে নিই।

এই ৩৭ পয়সার টিকিটের আসনে সমাজের বিভিন্ন রকম বর্ণময় চরিত্রের দর্শক দেখা যেত।

যেমন, একশ্রেণীর সাধারণ দর্শক ছিল / ছিলেন, যাদের কাছে প্রতিদিন নিয়ম করে সিনেমা দ্যাখাটা একটি অন্যতম নেশা। প্রতিদিনের দর্শক বলে, লাইনের অন্যান্য দর্শকদের প্রায় সবাই মুখ চিনতেন এদের। আরেক ধরণের দর্শক ছিলেন (যাদের মধ্যে হয়তো আমিও পড়তাম), যারা বাকস্বাধীনতা উপভোগ করতে করতে ছবি দেখতে চান। সিনেমা চলাকালীন কী যে না ঘটত। জোরে জোরে বলা সরস বা রসালো মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া…

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিনেমা চলাকালীন প্রায়ান্ধকার হলে হঠাৎ করে কোনও বাচ্চা যদি কেঁদে উঠতো, তাহলেই শুরু হয়ে যেত, ' হল থেকে বাচ্চাটিকে বাইরে বেরিয়ে নিয়ে গিয়ে হিসি করিয়ে আনুন (সঙ্গে একত্র সহযোগে মুখনিঃসৃত শু শু শব্দ ; এ ছাড়াও আরও কিছু না বলা সুভাষিত বাণী।

এরপর সিনেমার নায়ক-নায়িকার কোনও বিশেষ ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের অবতারণা হলে, আবার সেই আওয়াজ (এবার জড়িয়ে ধর), এছাড়াও ছবির খলনায়কের উদ্যেশ্যে বাছা-বাছা শব্দাবলী, কোনও চটুল নাচ-গানের দৃশ্যে সজোরে সিটি, নায়কের বীরোচিত ভূমিকায় সহর্ষ হাততালি এবং চিৎকার। প্রবল দুঃখের দৃশ্যে সজোরে ভেউ-ভেউ করে কান্নার আওয়াজ…

আরও যে কী কী ছিল।এবারে আসি হলে ঢোকার মুহূর্তের এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি।

প্রথমেই টিকিট নিয়ে লম্বা টর্চ হাতে টিকিটের নম্বর দেখে আসন মিলিয়ে বসার জন্য লাইটম্যান এর কাছে যাওয়া। তারপর নির্দিষ্ট আসনে বসার কিছুক্ষণ পরেই সজোরে ক্রিরিইং করে ঘন্টি বেজে উঠতো।

হলের সমস্ত আলো নিভে গিয়ে পর্দা উঠে বা সরে যেত।

হলের একেবারে পিছনের দিকের সবার উঁচুতে আলাদা ঘর ছিল প্রজেক্টর ম্যান এর। পাশেই থাকতেন সহকারী। ওই ছোট ঘুলঘুলি দেওয়া ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে

প্রজেক্টর ক্যামেরায় রীল লাগিয়ে শুরু করে দিতেন তখনকার শো এর দৃশ্যের আলোকপাত। ছোট চৌখুপি জানলা দিয়ে সজোরে এসে পর্দার উপরে পড়ত। প্রথমেই থাকতো কিছু চলমান (সাদা-কালো এবং রঙ্গীন) নামি বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

সেসব বিজ্ঞাপন এর কয়েকটি বেশ মজাদার এবং দর্শকদের মুখে মুখে ফিরতো।

এরমধ্যে বেশকয়েকটি বিজ্ঞাপনের কথা না বললেই নয়।

সেসময়ে প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট অঙ্কিত শ্রীযুক্ত চন্ডী লাহিড়ীর কয়েকটি লাইভ সরব কার্টুনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ছিল এককথায় অনবদ্য।

তারমধ্যে ছিল, কাশির সিরাপ ' গ্লাইকোডিন, জামা-কাপড় কাচার ওয়াশিং পাউডার ডেট, শুভ্রতার জন্য টিনোপল / রানীপল।

আর ছিল বিখ্যাত বাটা কোম্পানির জুতো।

এরসাথে দেখানো হতো (এসব এবং স্থির চিত্রের বিজ্ঞাপন ছবির হাফটাইম বা বিরতির সময়ও দেখানো হতো)।

তখনকার পরের আগত সিনেমার খন্ডচিত্র।

আর, অতি অবশ্যই তখনকার হৈ চৈ ফেলে দেওয়া ঘটনাবলী নিয়ে ছোট সরকারী তথ্যচিত্র।

সেটি কোনও স্থানীয় খবর বা ঘটনা হতে পারে, অথবা আন্তর্জাতিক।

যেমন এভাবেই চাক্ষুষ করেছিলাম বেশকিছু ঐতিহাসিক ঘটনা।

যেমন, নীল আর্মস্ট্রং এর প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখা, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম স্যার এডমন্ড হিলারী এবং তেনজিং নোরগের এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ, ৭১এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের মেজর জেনারেল কর্ণেল মানেকশ ও পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধবিরতি এবং আত্মসমর্পণ চুক্তি।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ৪

পহেলা বৈশাখ, এসো এসো

দিবাকর দাস

পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। বাংলা বছরের প্রথম দিন। এ দিনটির মাধ্যমে বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যুক্ত হয় নতুন আরেকটি বছর। জীর্ণ-পুরাতন সবকিছু ভেসে যাক, 'মুছে যাক গ্লানি' - এভাবে বিদায়ী সূর্যের কাছে এই দিনে আহ্বান জানায় বাঙালি। বাংলার চিরায়ত উৎসব চৈত্রসংক্রান্তির পরের দিনেই পহেলা বৈশাখ। সকল সঙ্কীর্ণতা, কূপমুণ্ডকতা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করার দিন।। আমাদের মনের ভিতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে এই দিনটি আমাদের নতুন উদ্যমে বাঁচার প্রেরণা দেয়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণে আমাদের এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়। পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসবও বটে। এ দিন আনন্দঘন পরিবেশে গোটা বাংলাদেশে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছরকে। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় এই নববর্ষ।

প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে বর্ণিল উৎসবে মাতবে দেশ। ভোরের প্রথম আলো রাঙিয়ে দেবে নতুন স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর সম্ভাবনাকে। রাজধানীসহ দেশজুড়ে থাকবে বর্ষবরণের নানা আয়োজন। এক সময় নববর্ষ পালিত

হত ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির; কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। পরে কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌর সনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় নতুন এ বাংলা সাল।

অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তারা নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি পালিত হয় আজও।

মূলত ১৫৫৬ সালে কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমদিকে পরিচিত ছিল ফসলি সন নামে, পরে তা পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে বাংলাবর্ষের ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এর সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সংযোগ ঘটেছে।

পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। আর ষাটের দশকের শেষে তা বিশেষ মাত্রা পায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনের মাধ্যমে। এ সময় ঢাকায় নাগরিক পর্যায়ে ছায়ানটের উদ্যোগে সীমিত আকারে বর্ষবরণ শুরু হয়।

আমাদের মহান স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উৎসবের পাশাপাশি স্বৈরাচার-অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এসেছে পহেলা বৈশাখের আয়োজনে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বের হয় প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা। ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো এ শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়।

রঙে রেখায় রাজপুতানা (দ্বিতীয় পর্ব)

আদিত্য সেন

বশিষ্ঠের জীপ চলেছে সাম ছাড়িয়ে। অমরকোট যেতে আসতে হলে লোকেরা ধরত সাম-কি টিলার পথটা--যেখানে গেলে এখনও পুরনো দিনের আঁচ পাওয়া যায়। দিনের বেলা কাঠফাটা রোদ্দুর, গরমকালে গরু-মোষ হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তপ্ত বালির ওপর বসে পড়ে। দূরে দূরে ইলেক্ট্রিক পোলের এতটুকু ছায়া। মাথায় ন্যাবাটে রঙের পাগড়ি এঁটে যে ছেলেটা গরু-ছাগল চরাচ্ছে সে ওটুকু ছায়ায় রোদে ঝলসান চোখ দু'টোকে একটু আরাম করে নিচ্ছে। দূরে দূরে কুয়ো। বৃত্তের আকারে লাইন-করা মশকে জল তোলে উট। একশো ফুট গভীরে কুয়োতে জল থাকে। নয়ত জল শুকিয়ে যায়। জল তুলতে ঘন্টাখানেকও লেগে যায়।

এই পথ দিয়ে পাকিস্থান সীমান্ত খুব কাছে। এখন থেকে পাকা রাস্তা, জীপ চলছে উর্দ্ধশ্বাসে। সঙ্গে জয়সলমের-এর বন্ধু রতনু। রতনু সামনের রাস্তাটা দেখিয়ে বলল--এখন অমরকোটের সেই পথ আর কেউ খুঁজে পাবে না। মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই ভয়াবহ পথটা এই পাকা রাস্তায় হারিয়ে গেছে। এই পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, '৬৫-এর যুদ্ধের পরে। পরমানন্দ ড্রাইভার হালের অনেক খবর রাখে। প্রশ্নের জবাবে বেশি কথা বলে ফেলেছিল।--আসলে কি জানেন, '৬৫ সালের আগেও জয়সলমের খাঁ খাঁ করত। আগে রেললাইন ছিল পোকরাণ পর্যন্ত। যুদ্ধের পরে ১০৫ কিলোমিটার

রেললাইন তৈরী হল। ১৯৬৮ সালের আগে এখানে শুধু মালবাহী ট্রেন চলত, সেই বছরই যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হল। এখন তো সকাল বিকেল জয়সলমের-এর ট্রেন চলে। কত লোক আসে। এছাড়া বাস অনবরত চলছেই। বাসে যোধপুর ছয়-সাত ঘন্টার রাস্তা। বশিষ্ঠ বিস্ময়ে ভাবল একসময় যোধপুর-জয়সলমের পথে একটা স্যাটল ট্রেন শুধু জলের ব্যারেল নিয়েই আনাগোনা করত। ট্রেনের কোন বালাই ছিল না। স্যাটল্ ট্রেনটা যখন একটা চিহ্ন দেওয়া জায়গায় ঢুকত, রুক্ষ শহরের সমস্ত রুক্মিণীরা কলসী ক্যানেস্তারা, যা হাতের কাছে পেত, সেই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। শুধু জল আর জল। হাজার বছরের তৃষ্ণা আজও মিটল না।--আগে এই মরুস্থলে কেউ আসত না। পরমানন্দকে যেন গল্পে পেয়েছে। সমানে বলে যাচ্ছে। বশিষ্ঠের মজা লাগছে শুনতে।--তখন তো অত টুরিস্টের দমকা হাওয়া বইত না।

সত্যি বশিষ্ঠ দেখে অবাক হয়েছিল--দেশী-বিদেশী টুরিস্ট, এরা এত দূরদেশে এসেও নিজেদের মধ্যেই বেশি কথা বলে। এদের জানার আগ্রহ যেন একটু ক্ষীণ। অবশ্য জয়সলমের-এর এই ছোট্ট শহরে কিই-বা আর দেখবে! কখন এসেছে হোটেলে, খাওয়া শেষ করতেই বিকেল গড়িয়ে যায়। কয়েক ঘন্টার জন্য দেড়শো টাকার বিল দিতে দেখেছিল বশিষ্ঠ। অথচ একটু এগোলেই দেখতে পেত তখন হাট বসেছে। মেয়েরা-বউরা নানা রঙের ঘাগরা পরে ঘোমটার আড়ালেই দৃষ্টি মেলে সওদা করছে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় এক একটা মুখের আলো চকিতে ধরা পড়ে-কি সুন্দর তাদের শরীরের গড়ন, কি হাসিখুশি সব চেহারা। পাশের রাস্তার মোড়ে বাঁক নিল উটের গাড়ি। লোকটা হলুদ ছোপ লাগা ম্যাজেন্টা রঙের পাগড়ি দেখিয়ে চলে গেল। এসব ছোট ছোট চিত্রপট দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই টুরিস্টদের।

জয়সলমের-এর টুরিস্ট বাসটায় বেশির ভাগই বিদেশি টুরিস্ট। তাদের মধ্যে অনেকে কানে ওয়াকম্যান দিয়ে বসে থাকে। দূরে একটা উটে করে কিছু লোক আসছে--মেয়েটি একটি উট ধরে দাঁড়িয়ে। রাস্তা মেরামত হচ্ছে-অনেক মেয়ে-পুরুষ কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে কাজে সামিল হয়েছে। পথ ছেড়ে দিচ্ছে বলে বশিষ্ঠদের জীপ এগিয়ে গেল। এদের দেখে সেদিন বশিষ্ঠ ভেবেছিল - এরা কেউ ঐ পথের সন্ধান পায়নি--যেখানে মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকত আর মরুদেশে যাবার পথটা নিজের বুকে টেনে নেবার হাতছানি দিত।

বশিষ্ঠের আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। জয়সলমের ফোর্টের ভেতরে একটি এন্টিক দোকান একজন জার্মান মহিলাকে ডাহা ঠকান ঠকিয়েছিল। পায়ের রুপোর দুটো মল একসঙ্গে বেঁধে ব্রেসলেট বলে চালিয়ে দিয়েছিল। কয়েক হাজার টাকা খসিয়ে

ব্রেসলেটটাকে সে যাচাই করাতে এসেছিল বশিষ্ঠের কাছে। বশিষ্ঠ একটু মুচকি হেসে রুপোর তারটা ছিঁড়ে ফেলে বলল--পায়ে পর, খুব সুন্দর লাগবে। দেখে মেমসাহেব ত থ ।

--আর বেশি দূর এগোন যাবে না স্যর। মিলিটারি গাড়ি আটকে দেবে। কত লোক এখনে স্মাগলিং করে যে বড়লোক হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তাও কি স্মাগলিং বন্ধ করা গেল? রতনু বলল--জীপ ঘোরাও, ফেরা যাক। সাম-কি-টিলা দেখে ফিরতে সময় লাগবে।

বশিষ্ঠ এবারও ধূ ধূ প্রান্তর দেখতে দেখতে চলেছে, দূরে দূরে কাঁটা গাছ। রতনু বলল--একশো কিলোমিটার বৃত্তের মধ্যে কোন গাছগাছড়া নেই। জনশূন্য এলাকা বলে এর নাম পালি। শীতকাল, তাও দেখুন রোদের কি তাপ ! কাঁটা গাছগুলিতে অত পাতা নেই, সমস্ত গাছটা যেন জালি দিয়ে ঘেরা। বশিষ্ঠ কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না। জিজ্ঞেস করল-কাঁটাঝাড়গুলির নাম কি বলতে পারেন? জয়সলমের-এ এই গাছ খুব দেখছি।

রতনু এই এলাকার মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল-মারোয়াড়ে যাকে জুলা বলে সেগুলিই এখানে পিলু। গাছগুলি পাঁচ-ছয় ফুটের বেশী হয় না, দেখুন রঙটা যেন বটলগ্রীন। রঙের কথাটা বশিষ্ঠের কানে সুরের মত বাজল। মানুষের কথাবার্তায় রঙ রস না থাকলে কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে লাগে বশিষ্ঠের! রতনু বলে যাচ্ছে, বশিষ্ঠ মিলিয়ে নিচ্ছে জানা ও অজানা পৃথিবীটাকে।

--পিলুর মতই আর এক রকমের ঝাড় হয় এখানে, তার নামও ভারি সুন্দর, দুল্লা। মিষ্টি চেহারা, দুল্হনের মত লাগে কথাটা। এতে বৈঁচিজাতীয় ফল হয়, পানসা মিষ্টি স্বাদ। জুলা বা পিলু গাছে দু'রকম বৈঁচি ফল হয়, দেখতে ছোট আঙুরের মতো। আবার লাল রঙেরও । গাছগুলো যখন লাল বৈঁচি কানে লাগিয়ে দাঁড়ায়, মনে হয় ঠিক যেন দুল্হন। কালচে স্প্যানিশ দ্রাক্ষা ফলের মত দেখতে। বেশ বড় হয়। এ এলাকায় আরও অনেক ঝোপঝাড় আছে। যেমন সিনিয়া, বই, লারা, মুরট দিয়ে এদেশের লোক কুঁড়ে তৈরী করে--যা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন জয়সলমের-এ। বিশেষ করে সিনিয়া ঝাড় খুব কাজে লাগে। বলুন ত এদিকে কুঁড়েঘরগুলি সব গোল গোল কেন ?

বশিষ্ঠ কথাটা শুনে একটু হাসল। রাজস্থানের নানা এলাকায় বহুদিন ধরে ঘুরছে। ওর ডায়েরীর স্কেচগুলি রতনুর চোখের সামনে খুলে ধরলে বুঝতে পারত কার সামনে তলোয়ার খুলছে। শুধু বলল--বলুন ত চাকা কেন গোল হয় ? রতনু খা খা করে হেসে উঠল--আপনি খুব চালাক দেখছি। বলেই কেন এখানকার ঘর গোল, সেটা বোঝাতেই বলল--এখানে যখন তখন বালির ঝড় ওঠে, তার গতিবেগ ঘন্টায় একশো কিলোমিটার হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। ছুটে যাবে অন্য দিকে। এদিকে গোলা ঘর ছাড়া বাঁচার পথ নেই।

বশিষ্ঠ ঘুরে এসে দাঁড়াল সাম-কি-টিলার কাছে। সূর্য সোনালী রঙ ছড়িয়ে বালির সমুদ্রে একটা যেন মরীচিকার সৃষ্টি করেছে। জনশূন্য বালির প্রান্তরের বুক চিরে লম্বমান হয়ে শুয়ে আছে যেন নগ্ন সব নারী দেহ, সৌন্দর্যে যা অপরূপ। বশিষ্ঠ দাঁড়িয়ে দেখছিল;রতনুর কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিল না। পরমানন্দ জীপেই বসেছিল। সূর্যের সুষমায় ভরা এক একটি পেইন্টিং যেন অনন্ত প্রতীক্ষায় রত; কত বিচিত্র তার পট বিভাজন-কত ভঙ্গী, কত রূপ! এ অতলান্তিক সৌন্দর্যের এক টুকরো আলো পড়ছিল বশিষ্ঠের মনে, হঠাৎ কার ডাকে চমক ভাঙ্গল বশিষ্ঠের।

--সাব্ উটের পিঠে চড়বেন? উট চালক বশিষ্ঠের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। উটের পিঠে চড়া বেকায়দা প্রস্তাব। যতদূর জানে এটা ওদের মেটিং সিজন। উটের মুখ-চোখের অনেকটা কাপড়ের পটি দিয়ে ঢাকা; ব্রহ্মচর্য পালনের অপূর্ব কায়দা। দূরে যদি উট কোন উটিনীকে দেখতে পায়, তবে ছুট দেবে। দৌড়টি দেখবার মত হলেও আরোহীর পক্ষে সেটা খুব সুখদায়ক অভিজ্ঞতা হবে না। হাত-পা ভেঙ্গে অজানা অপরিচিত প্রান্তরে পড়ে থাকাও বিচিত্র নয়। বশিষ্ঠ এসব কথা ভেবেই ইতস্তত করছিল।

--সার্, দূরে না গেলে মজা আসে না। বলে সে উটটাকে হাত দিয়ে বালির ওপর বসাল।

কি আর করে বশিষ্ঠ, একবার রতনুকে ডাকল, সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে যাবে না।

বশিষ্ঠকে সে যেন উপরের দিকে প্রবল একটা ধাক্কা দিল। সামলে উঠতে না উঠতে দেখে উটের পিঠে সে এগিয়ে যাচ্ছে। উট আর যাই বুঝুক, সৌন্দর্য কি জিনিস নিশ্চয় সেটা জানে না। সাম-কি-টিলার বালির ওপর দিয়ে উট ধীরে ধীরে চলছে বটে কিন্তু বশিষ্ঠের মনে হচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি এপার-ওপার করছে সে। উট নিজের মর্জিমত বালির পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে আবার তেমনিভাবে বিনাবাধায় নেমে আসছে। উটের মালিক সঙ্গে সঙ্গে চলছে, মাথায় নানা রঙের পাগড়ি, সূর্যের আলোয় আরও রঙ ছড়াচ্ছে। সৌন্দর্যবোধ পায়ের নিচে বালির ওপর টোপ কাটছে।

এইসব সোনার মুহূর্তের নানা আঁকিবুকি পাতার পর স্কেচ করে গেছে বশিষ্ঠ। স্কেচ বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিল আর মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই সব জীবন্ত ছবির কথা। আঁকতে আঁকতে থেমে যায়--কোন একটা ছবি দেখে তার পরিবেশ মনে পড়ে। আর এগোন হয় না। অন্যমনস্ক হয়ে আবার আঁকে; ভাবনার শত মেঘের টুকরো ঈশান কোণে জমা হয়। তাকিয়ে দেখে কালো মেঘাবৃত আকাশ, মেঘগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় দক্ষিণের পথে। নিজেকে হারায় নিজেরই অতল গভীর রাজ্যে। দরজায় কলিং বেল। হরিপদ দরজা খুলে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। আঁকার মুহূর্তে আবার কে এল? স্টুডিওর দরজায় ঘাগরা-পরা এক রাজস্থানী মেয়ে। মুখে দীপ্ত হাসি। --কি আঁকছিলেন? ডিস্টার্ব করলাম তো! নিবেদিতা রায় নীল জলের মতো স্বচ্ছ চোখে শুধাল।

--এসো নিবেদিতা, এই সময় যে--নাকি রাজস্থানী ঘাগরা পরেছ বলে দেখাতে এলে--।

স্নিগ্ধ হাসির আলো ছড়িয়ে নিজের ঘাগরার জাফরানি রঙটার তারিফ করে বলল--বড় ভাল লেগে গেল এটা দেখে। কিনে নিলাম। মনমত চূর্ণী কিনেছি আপনাদের লাজপত্ রায় মার্কেট থেকে। এমন ফ্যাশনের বলিহারি যে, যা আজকাল রাজস্থানে পাওয়া যায় না তা নির্বিবাদে দিল্লী দরবারে বিকোচ্ছে। নিবেদিতা দাঁড়িয়ে রইল।

হাসির রঙ ঢলে পড়ছিল চূর্ণী ছুঁয়ে ঘাগরায় । –বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ও, দেখতে চাও কি আঁকছিলাম? বেশ, এদিকে এসো। কিছুই বিশেষ দেখতে পাবে না। চিত্রপটে তুলি আর রঙ নিয়ে এবার শুধু খেলব--তাতে আর্ট হবে কিনা জানিনা, সময়টা অন্তত ভাল কাটবে।

নিবেদিতার মুখে তখনও হালকা নীল রঙের হাসি। এগিয়ে এল ক্যানভাসটা দেখতে। দেখল দূরে হরিদ্রাভ ধুলোর ঝড়ের আভাস। একটা রাস্তাকে ছুঁয়ে ঝড়টা যেন উঠছে ভূমণ্ডলে। রাজস্থানী এক স্বপ্নের মেয়ে চূর্ণী টেনে দিয়েছে মুখের সামনে; হালকা চূর্ণী বাতাসে উড়ছে আর ভয়ার্ত দুটো চোখ আকাশ ছুঁয়ে দেখছে নিরাপদ কোন দুর্গের সীমা।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ৬

সাবধান হোন গরমে

অলক দে

এপ্রিল চলছে। এই মাসেই গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে গরমের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে বেশি। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে তাপপ্রবাহ এবং লু । এই পরিস্থিতিতে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা উচিৎ। এরকম তাপপ্রবাহের কারণে বমি, ডায়রিয়া ও জ্বরের মতো সমস্যা দেখা দিলেও দিতে পারে। শরীরে অস্বস্তি আর সেই সঙ্গে দুর্বলতা বাড়তে পারে। সবচেয়ে বেশি হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকছে এই মরশুমে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময়টায় দেখা যায় সাধারণত সবচেয়ে বেশি গরম থাকে। সম্ভব হলে এই সময়টা বাইরে বের হওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইরে যেতেই হয় তাহলে অবশ্যই টুপি, ফুলহাতা জামা ও জুতো ব্যবহার করুন। এইরকম পোশাক আপনাকে হিটস্ট্রোক থেকে রক্ষা করবে। প্রচুর পরিমাণ জল খান, নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন। সাধারণ জল ছাড়াও পারলে লেবু জল, ডাবের জল খান। তেষ্টা না পেলেও বারবার জল খেতে হবে। কারণ গরমে ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে অধিক পরিমাণ জল বেরিয়ে যায়। তাই জল না খেলে ডিহাইড্রেট হতে পারে এবং তার থেকেও সানস্ট্রোক হতে পারে।

অবশ্যই সুতির কাপড় পরুন। কারণ পোশাকের জন্যও আপনি হিটস্ট্রোকের শিকার হতে পারেন। সুতির কাপড় আপনার শরীরে হাওয়া চলাচল ঠিক রাখবে, যার ফলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও বজায় থাকবে।

গরমে বেশি মশলাদার, ভাজাভুজি বা চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না। এই খাবারগুলি শরীরে আরও গরম বাড়িয়ে তোলে এবং শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে। যতটা সম্ভব অল্প খাবার খান। ফল এবং শাকসবজি বেশি করে খান। এতে শরীর ঠান্ডা থাকবে এবং হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমবে। কখনই খালি পেটে ঘর থেকে বের হবেন না এবং দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকা এড়িয়ে যাবেন। খুব বেশি গরমে চা এবং কফি থেকে দূরে থাকুন। এতে ক্যাফেইন থাকে যা শরীরকে ডিহাইড্রেট করতে পারে। এ কারণে আপনি হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন। প্রবল গরমে অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঠান্ডা পানীয়ে চুমুক দেন। কোল্ড ড্রিংক, আখের রস, প্যাকেজড ফ্রুট জুসের মতো এরকম নানা পণ্যই বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁদের ডায়েবেটিস রয়েছে, তাঁদের এক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। যাঁদের ব্লাড সুগার রয়েছে তাঁদের জন্য লিক্যুইড সুগার খুবই ক্ষতিকর। সেই কারণেই ব্লাড সুগার থাকলে কোল্ড ড্রিংকের মতো পানীয় এড়ানো উচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁরা প্রি ডায়েবেটিক স্টেজে আছেন, তাঁদেরও কোল্ড ড্রিংক জাতীয় পানীয় খাওয়া উচিত নয়। এতে তাঁদের সুগার হওয়ার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। তবে গরমে ডায়াবেটিসে আক্রান্তরা লেবুর জল, ছাতু অথবা বেলের শরবৎ, চিয়া সিডস দিয়ে তৈরি পানীয় ইত্যাদি খেয়ে নিজেদের তরতাজা রাখতেই পারেন। সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

লেখা ৭

বাড়ছে বায়ু দূষণ

দেবেশ দত্ত

ক্রমাগত বাড়ছে বায়ু দূষণের পরিমাণ। গত কয়েক বছর ধরেই দেশের রাজধানী দিল্লির বাতাসে দূষণের পরিমাণ উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে। প্রায় একই পরিস্থিতি অন্য শহরগুলিতেও। বিশেষত শীতকাল শুরুর আগে পরিস্থিতি এমনই হয়ে পড়ছে যে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। চোখ থেকে শুরু করে হৃদযন্ত্র, এমনকী ত্বকেও বায়ুদূষণের কুপ্রভাব পড়ছে।

বায়ুদূষণের সঙ্গে কনজাংটিভাইটিসের যোগ রয়েছে। নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হসপিটালের চক্ষুরোগ বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. উমা মালিয়া বলেছেন, ‘বায়ুদূষণ ক্রমশ বাড়ছে। এতে কনজাংটিভাইটিস বাড়তে পারে। কনজাংটিভা আসলে একটি পাতলা ঝিল্লি যা চোখের সামনে এবং চোখের পাতার ভিতরের পৃষ্ঠকে ঢেকে রাখে। বায়ু দূষণের প্রভাব তার উপর পড়তে পারে।’

তিনি জানান, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, উদ্বায়ী জৈব যৌগ এবং অন্য বায়ুবাহিত দূষিত পদার্থ কনজাংটিভাইটিস ঘটাতে পারে। তার ফলে চোখে লালভাব, জ্বালা, চোখের মধ্যে একটি তীব্র সংবেদন দেখা দিতে পারে। উচ্চ AQI মাত্রা এবং বায়ু দূষণের ফলে কনজাংটিভাইটিসের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন চুলকানি, আলোয় সমস্যা হতে পারে। চোখে জ্বালাভাব হতে পারে বা লালভাব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদূষণের ফলে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে। চোখ ঘষাঘষির ফলে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সাধারণ বায়ুদূষক কনজাংটিভাইটিস সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, ধূলিকণা এবং উচ্চ ওজোন থাকতে পারে। এর ফলে শুষ্ক চোখের মতো ক্রনিক রোগও তৈরি হতে পারে। এমনকী অ্যালার্জিও হতে পারে দূষণ থেকে। আবার যাঁদের আগে থেকেই এই প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের উপসর্গ বেড়ে যেতে পারে। বায়ুদূষণ থেকে চোখের নানা রকম সমস্যা হতে পারে, তাই চোখকে রক্ষা করতে চশমা ব্যবহার করুন। অপ্রয়োজনে বাইরে না ঘোরাই ভালো। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দূষণ রোধে মানুষের সচেতনতা আশু প্রয়োজন। না হলে এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবেই।

লেখা ৮

নামিবিয়া-বোৎসোয়ানা-জিম্বাবুয়ে-ভিক্টোরিয়া ফলস্ ভ্রমণ (প্রথম পর্ব)

শিবাশিস চক্রবর্তী

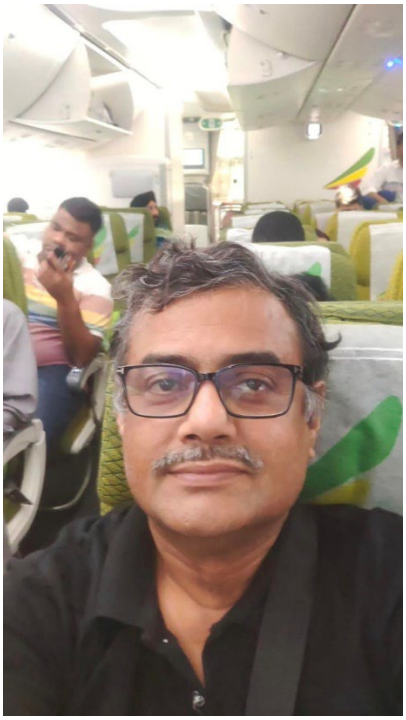

অনেকদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়নের অপেক্ষায় স্বভাবতঃই মন উচাটন। ভ্রমণসংস্থা ট্রাভেললাইভের এক অনুষ্ঠানে এই অভিনব ট্যুরের ভিডিও ক্লিপিংস দেখে আর দ্বিধা করিনি। বুকিং করে দিলাম।

অবশেষে এসে গেল ১৯শে মে। বিকেল সোওয়া ছটার ভিস্তারার UK 738 ফ্লাইটে প্রথমে যাবো দিল্লি। তারপর ২০শে মে ভোর আড়াইটের সময় দিল্লির আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট থেকে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে যাবো ইথিওপিয়ার রাজধানী, আদ্দিস আবাবা, মানে নতুন ফুল। সেখান থেকে আরেকটা ইথিওপিয়ান ফ্লাইট ধরে যাবো নামিবিয়ার রাজধানী, উইন্ডহোক, যার আফ্রিকান অর্থ বাতাস খেলে যায় এমন কোণ(windy corner)।

আমাদের সাথে এবারের যাত্রায় ভ্রমণ করছেন স্বনামধন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী, সস্ত্রীক সব্যসাচী চক্রবর্তি ও তার সহধর্মিনী, মিঠু চক্রবর্তি। আর আছেন ওকালতি জগতের নামকরা অশোক ব্যানার্জি। আর আছেন সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলের আমার এক সিনিয়র সহকর্মিনী, আমার বিভিন্ন বিদেশ ট্যুরের বেশ কিছু সহযাত্রী।

আমাদের ভ্রমণসংস্থা ট্রাভেললাইভ ভ্রমণজগতে বেশ নতুন। কর্ণধার সোম ও তার স্ত্রী, মহুয়া আমার খুবই কাছের দুই মানুষ। ট্যুর গাইড পিনাকি মিত্র কোম্পানির সিইও।

আমার ছোট ভাইয়ের মত। ওকে পাওয়ার জন্য অনেক যাত্রীরাই আকুল। আর এক গাইড, বয়সে বেশ নবীন, অর্ণব চক্রবর্তিকে পেয়ে আমাদের ট্যুর সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

যাত্রার শুরুতেই অর্ণব আমাদের নিয়ে একটা হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপ করে ফেলল। তার মাধ্যমে আমরা গোটা ট্যুরে নানান প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে গেছিলাম আর নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কলকাতা এয়ারপোর্টে ট্রাভেল লাউঞ্জে আমার ডেবিট কার্ড দেখিয়ে দুটাকার বিনিময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলাম। একসময় দিল্লিগামী ভিস্তারা কলকাতার নেতাজী সুভাষ বিমানবন্দর ছেড়ে নীলিমার মাঝে মেঘেদের রাজ্যে পাড়ি দিল। যথাসময়ে সেটা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল তিনের রানওয়ে চুম্বন করল।

আমাদের জন্য এরপর অপেক্ষা করছিল এক বিরাট সম্মান। দিল্লির নামিবিয়ার দূতাবাসের হাইকমিশনার, গাব্রিয়েল পি সিনিম্বো স্বয়ং বিমানবন্দরে এসে আমাদের দলটাকে স্বাগত জানালেন। আমরাই নাকি প্রথম ভারতীয় দল, যারা নামিবিয়া ভ্রমণে গেল। এটা পিনাকি হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে আমাদের এই যাত্রার গেট্ টুগেদার এ ঘোষণা করেছিল। স্বভাবতঃই আমরা সবাই উত্তেজিত ছিলাম। সবার সাথে গাব্রিয়েল ছবি তুললেন। আমাদের হাতে ধরা ছিল ভারত ও নামিবিয়ার জাতীয় পতাকা।

এরপর ঘটল আরেকটা চমক।

গাব্রিয়েল যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন আমি তার সাথে আলাপ করে জানালাম যে, আই ক্যান সিঙ্ ইয়োর ন্যাশন্যাল অ্যানথেম্।

ইজ্ ইট্!

তারপর দুজনে হাতে হাত ধরে গানটা গাইতে গাইতে গেলাম। উনি বিস্মিত হয়ে আবেগবশতঃ ওনার একটা ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিলেন। এটা আমার কাছে একটা বিরাট বড় সম্মান।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ধরার সেই চিরাচরিত সিকিউরিটির বিভিন্ন বেড়াজাল টপকাতে গিয়ে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো। ইতিমধ্যে ক্লান্ত, অবসন্ন আমরা শোওয়ার জায়গা না পেয়ে কোনওমতে বসার জায়গা ম্যানেজ করেছিলাম। কিছু মজার ব্যাপার ঘটল। যেমন, সহযাত্রী ড. গৌতম রায়ের নতুন কেনা প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে আমাদেরই অপর এক সহযাত্রী দিদি সেটাকে রিফু করে দিলেন।

অবশেষে রাত আড়াইটের বদলে বেশ কিছুটা দেরীতে আদ্দিস আবাবাগামী ইথিওপিয়ান ফ্লাইট ইটি ৬৮৭ এক আসন্ন অনিশ্চয়তা নিয়ে আকাশের বুকে উড়ে গেল। সাড়ে সাত ঘন্টা পর তার পৌঁছানোর কথা ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে, সকাল ছটা পঞ্চাশে, ভারতীয় সময় সকাল দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। ব্যাস, যথারীতি দেরীতে সেটা আদ্দিস আবাবা পৌঁছালো। এদিকে আটটা পঁয়ত্রিশে আদ্দিস আবাবা থেকে উইন্ডহোকগামী ইটি ৮৩৫ ছেড়ে দেবে। আমরা তাহলে কি করে এয়ারপোর্টে নেমে পুনরায় সিকিউরিটি চেকিং করে সেই ফ্লাইট ধরব?

সে এক দারুণ উত্তেজনার এক মজার অবসান ঘটল, যা আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা!

এর পর আগামী সংখ্যায়

হ্যালো, কক্সবাজার

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

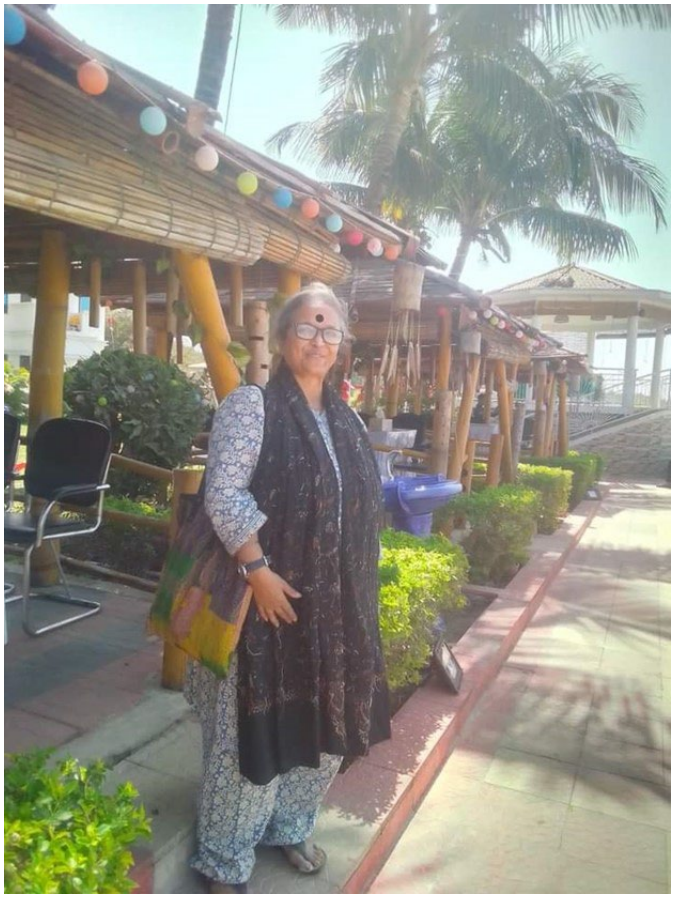

সোলো ট্রিপ! সবাই খুব বলে আজকাল। আর আমি ভাবি কী, আমার জীবনটাই তো মূলত সোলো ট্রিপ। তবু এবার ঢাকায় আমন্ত্রণ পেলাম যখন আমি বায়না ধরলাম একা একা কক্সবাজার যাব। ওরা বলল, হ্যাঁ দিদি, ওখানে আছে তো অনেকে। অসুবিধা হবে না, কক্সবাজারেও না হয় অনুষ্ঠান হবে একটা। আমি আঁতকে উঠে বললাম, না না, কোনো সাহিত্যচর্চা নয়। একদম একা একা কাটাব একটা দিন আর রাত।

পুরী গেলে যেমন স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি ভিড়ে মোটেই থাকি না, এখানেও চেয়েছিলাম দূরের কোনো নির্জন বিচে থাকব। কক্সবাজার তো পৃথিবীর দীর্ঘতম বিচ। যাতায়াত, হোটেল সব ব্যবস্থা হল বন্ধুর হাতযশে। গ্রীনলাইনের বাসে রাত এগারোটায় আল্লার নামে উঠে পড়লাম। ওমা! ভেতরে পুরো ট্রেনের মতো শোয়ার জন্য বার্থ। কম্বল বালিশ সব দেওয়া আছে। ভোর ভোর চট্টগ্রাম এল। কর্ণফুলি নদী পার হলাম। দশটা নাগাদ কক্সবাজার। তারপর একটু খুচরো ঝঞ্ঝাট সামলে ইনানি বিচ ও আমার হোটেল। এবং,রুম থেকে, খেতে বসার ছোট ছোট কিয়স্ক থেকে, সমুদ্র,শুধু। এমনটাই তো চেয়েছিলাম আমি!

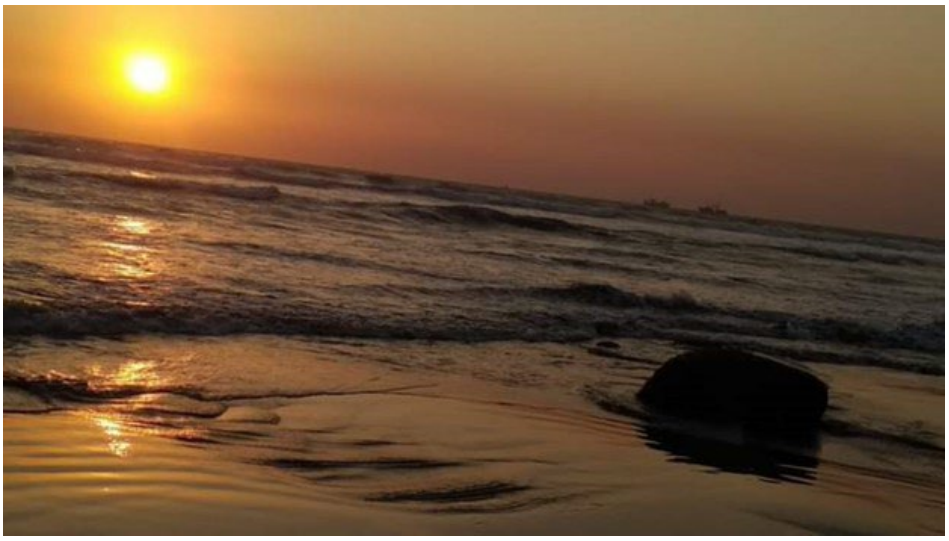

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হীরম কক্স এই সমুদ্রতীর খুঁজে পান। সম্ভবত তাঁর নামেই বিচটির নাম হয়।আরেকটা জিনিসও জানতে পারলাম, কক্সবাজারকে পালঙ্কি ডাকা হত।এটার কারণ জানতে পারলাম না অবশ্য। কিন্তু যেদিন গেলাম সেদিনই বিকেল আর সন্ধ্যের ঝোঁকে বড় সুন্দর এক রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম।তার নামও পালঙ্কি। ওখানকার, হাসিমুখ দোকানের কর্মচারীরা বললেন বার্বিকিউ ফিশ খান। আপনার পছন্দমতো মাছ দেখিয়ে দিয়ে যান।একটু হতভম্বভাবেই গেলাম পিছু পিছু। মস্ত অ্যাকোরিয়ামে প্রচুর মাছ খেলে বেড়াচ্ছে আর ওরা জানতে চাইছে, কোনটা? কোনটা? বেশি অ্যাডভেঞ্চারের দিকে না ঝুঁকে নিরাপদ মাঝারি মাপের চিংড়িই বেছে নিলাম আমি। আর, সমুদ্রতীর ? দেখে দেখে আমার চোখের তো আর তৃষ্ণা মেটে না। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত,ভাবা যায় ? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কক্সবাজারে সন্ধ্যা মনে পড়ছিল।একা। নিঃশব্দ।

একটা রাত কাটল প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সমুদ্র দেখে দেখে। সমুদ্র থেকে চোখ না সরিয়েই বেডটিও খেলাম জলের দিকে চেয়ে।

ফিরতে হবে...

তারপর তো কক্সবাজারকে টা-টা করে সোহাগ পরিবহনের মসৃণ বিলাসবহুল বাসে সাড়ে এগারোটা নাগাদ চেপে বসলাম।রাতের বাস ইচ্ছে করেই নিইনি। বাংলাদেশ দেখতে দেখতে

যাব,এমনটা ভেবে। সে যে কী ভুল হয়েছিল।বাস চলল গরুর গাড়ির স্পিডে।আই সোয়্যার, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। সবরকমের যানবাহন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। অভিযোগ করাতে, হেল্পার যিনি, মধুর হেসে বললেন, উনি ওভাবেই গাড়ি চালান। আজ অবধি বাসের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি!

লাঞ্চের জন্য বাস দাঁড়াল। রেস্তরাঁয় খিচুড়ি খাব।বিফ না নিয়ে চিকেনই চাইলাম।গাড়ি চলে গাড়ি চলে।রাত নটার সময় ডিনারব্রেক। তখন কুমিল্লা। রাত একটায় ঢাকা। বন্ধু তাঁর গাড়ি নিয়ে হাজির। ফিরে, সাজানো ঘরে শুয়েই ঘুম। আমার জন্য নাস্তা সাজানো। জীবনে খাইনি এমন, চালের নরম তুলতুলে রুটি। সঙ্গে সবজি আর মাংস। ভাবলাম,যাক! ব্রাঞ্চ হয়ে গেল।

তারপর বন্ধুর ক্লিনিকে গেলাম। হার্ট ক্লিনিক। সেখানে অনাস্বদিতপূর্ব সব অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। প্রথমেই গ্র্যান্ড সংবর্ধনা। তারপর ঘুরেফিরে দেখে,ডাক্তার ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে আলাপপরিচয় সেরে বন্ধুর চেম্বারে এসে বসতে বসতেই তিনটে বেজে গেল।ওখানের মিষ্টি মেয়েটি,উপমা , ঘোষণা করল, এবার খাওয়াদাওয়া। আঁতকে উঠি আর কী। শুনলাম ওদের হেলদি কিচেনে শুধুমাত্র নাকি আমার জন্যই সব আয়োজন হয়েছে সেদিন। অক্লান্ত, আমাদের

ছবি তুলে যাচ্ছে মিলন। পুরো টেবিল ভর্তি করে খাবার পরিবেশন করা হল। একচামচ একচামচ খেলাম সবকিছু। তবে পদ্মার ইলিশ খেতে গিয়ে খাসির মাংস খেলাম না আর। ওখান থেকে বেরিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নজরুলের সমাধি,হাতির ঝিল,আড়ং সব সেরে,বাসা। রাতে খাইনি। পরদিন সকালেও না। ওখানে সেদিনেরও দাওয়াত। বলে রেখেছিলাম শুদ্ধুমাত্র ভাত ডাল আলুসেদ্ধ খাব। কিন্তু খাবার আয়োজন দেখে আবার চক্ষু ছানাবড়া।

সোজা এয়ারপোর্টে যাওয়া। বন্ধু এমনই আয়োজন করে রেখেছে,এয়ারপোর্টের রেস্ট্রিকটেড চত্বরেও সে আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল।

থ্যাঙ্কিয়ু দোস্তো। এমনটাই থাকিস বরাবর।

লেখা ১০

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (দ্বিতীয় পর্ব)

বাবলু সাহা

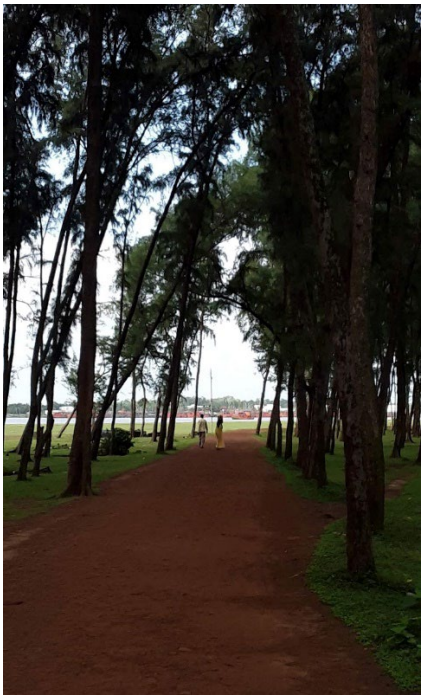

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পলাশের বাইকের পিছনের সওয়ারী হয়ে, পিঠে রুকস্যাক এবং দুটি স্লিপিং ম্যাট্রেস ইঃ নিয়ে বসতেই পলাশ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

মেঘলা ভেজা বাতাসের মধ্যে দিয়ে প্রথমে দ্বিতীয় হুগলী সেতু ক্রস করতেই আবার ঝিরিঝিরি করে বৃষ্টি শুরু হলো। অগত্যা বাইক থামিয়ে সাথের রেইনকোট গায়ে গলিয়ে নিয়ে ফের চলতে শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পরে বৃষ্টি আস্তে আস্তে ধরে এলো।

এরপর আমরা NH16 হাইওয়ে ধরে সুন্দর ছবির মতো, দু-পাশে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নির্জন রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, আমাদের বাইকের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৬৫ কিলোমিটার।

প্রায় ফাঁকা হাইওয়ে ধরে আমরা গেলাম প্রথমে নন্দকুমার হয়ে যেখানে রাস্তা দু-ভাগ হয়ে গেছে,

একটি রাস্তা সোজা গেছে দিঘার দিকে, আরেকটি বাঁদিকে নেমে গেছে হেঁড়িয়ার দিকে।

বাইক থামিয়ে ওখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে জেনে নিলাম জেলিংহ্যাম বন্দরের রাস্তা। এরপর আমরা অনতিদূরে একটি ছোট সিমেন্টের ব্রীজ পাড় হয়েই ঠিক

তার ডানদিকের খান ইট বিছানো রাস্তা ধরে গিয়ে পৌঁছলাম নন্দীগ্রাম ২ ব্লকে। সেখান থেকে আবার সোজা রাস্তা ধরে এসে পৌঁছলাম একটি পরিত্যক্ত জাহাজ কারখানার গেটের সামনে। বড় গেটের ঠিক মুখেই একটি স্টুলে বসেছিলেন সেই বন্ধ কারখানার একজন দ্বাররক্ষি। তারসাথে কথা বলে জানতে পারলাম, আরও কিছুটা দূরে এগিয়ে গেলেই বর্তমানে পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক সেই জেলিংহাম বন্দর। কিন্তু একমাত্র একটি বনবাংলো ছাড়া সেখানে থাকার কোনও জায়গা নেই। যদি সেখানকার মুখ্য বনপালের সাথে কথা বলে ওনার অনুমতি আদায় করতে পারি, তাহলে হয়তো রাতে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আবার বাইক চলতে শুরু করলো, যেতে যেতে চোখে পড়ছে এলাকাজুড়ে ছোট ছোট পুকুর-জলাশয়ে চিংড়ির চাষ।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, এই এলাকায় আগের মতো গ্রামের ভিতর দিকে ধান-সব্জি ইঃ র চাষবাস থাকলেও, অধিকাংশ গ্রামবাসী অতিরিক্ত অর্থের হাতছানিতে কৃষিকাজ ছেড়ে, বিঘার পরে বিঘা এই চিংড়ির চাষ করা শুরু করে দিয়েছেন।

যা কিনা ভবিষ্যতের জন্য মোটেই ভালো বিষয় নয়।

কিছুটা পথ যাওয়ার পরেই এলো সেই বনবাংলো। জায়গাটির নাম গাংরাচর। এটি নন্দীগ্রাম ১, বাজকুল বনাঞ্চল, পূর্ব মেদিনীপুর বনবিভাগ এর অধীন।

আমরা বাংলোর বড় গেটের সামনে বাইক রেখে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন প্রায় দুপুর।

ভিতরে ঢুকতেই দু-চোখ জুড়িয়ে গেল। চারিদিকে সব্জির গাছ, স্থানীয় নাম কাঁকড়াদাঁড়া (একধরনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ)র সুন্দর করে ছাউনি দিয়ে যত্ন করে চারা রোপণ করা। সামনের দিকে বিশাল প্রান্তরে সারি সারি সুবিন্যস্ত গাছ বেড়ে

উঠেছে। নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তার প্রথমেই বাঁদিকে সুন্দর পরিষ্কার মাঝারি মাপের কিচেন।

তার লাগোয়া সামান্য কয়েকজন কর্মীদের থাকবার ঘর। সেটা ছাড়াতেই চোখে পড়লো ছোট সাদা রঙের সাদামাটা একটি ঘর, যেটি মুখ্য বনপালের অফিসঘর।

আমরা দুজন ওনার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই আমাদের দুজনকে ওনার মুখোমুখি সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

এরপর উনি প্রশ্ন করতেই আমরা আমাদের এখানে আসার কারণ বিস্তারিত সংক্ষেপে জানাতেই উনি খুবই বিনীতভাবে বললেন যে, যেহেতু আমরা বাইরের লোক, সেই কারণে একমাত্র সরকারী বনবিভাগের লোক ছাড়া এখানে আর কাউকেই থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়না।

এবার পলাশ তার কথা শুরু করল।

খুবই বিনয়ের সাথে সেখানে একরাত (দুদিনও থাকা যেত) থাকার জন্য নিজের পরিচয়পত্র বা আইকার্ডটি বের করে ওনার হাতে দিলো, যেটা কিন্তু পলাশ সহজে কোথাও দেখিয়ে অন্যায় কোনও সুযোগ-সুবিধা নিতে চায়না।

সেইমুহূর্তে পলাশের কাজের জায়গা, ভবানী ভবনের ডি জি কন্ট্রোল রুমের পরিচিতটি দেখেই সেটি হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ উনি উপর মহলের একজন মহিলা আধিকারিককে ফোন করে সব বলতেই, উনি এককথায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। এর পর আগামী সংখ্যায়

এর পর আগামী সংখ্যায়

ইউরোপের ডায়েরি (তৃতীয় পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

সুইজারল্যান্ডের হোটেলটা দুর্দান্ত । সামনেই বড় একটা জায়গায় পিয়ানো রাখা আছে, একজন বাজাচ্ছে। বেশ কিছু বই রয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চেয়ার টেবিল ।ধূমায়িত কাপ হাতে বেশ আড্ডা দেওয়া যায়।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে চলে গেলাম যে যার ঘরে। আমাদের ঘরটা দারুণ। জানলা দিয়ে দেখা যায় আল্পস ।

সত্যিই অসাধারণ! বলে উঠলো নীলাঞ্জনা।

কাল আমরা যাবো তুষাররাজ্যে । বলে উঠলাম আমি।

আমি বরফ ছুঁড়বো। রূপকথা বলল।

তার কথায় হেসে উঠলাম আমরা।

এখানে ভীষণ ভালো লাগছে। বলল নীলাঞ্জনা।

সত্যিই ভালো লাগার মতই জায়গা।

একটু পরেই নীচে নামলাম সবাই। আমাদের গ্রুপের অনেকেই নেমে এসেছে।

চলো, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। বললাম আমি।

ঠিক আছে, চলো । ঘুরে আসা যাক।

বাইরে কনকনে ঠান্ডা। তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অন্ধকার নেমে আসছে। আল্পস দেখা দিচ্ছে আবছাভাবে। ঠাণ্ডা থাকলেও বেশ মজা লাগছে। ছাতা নেই সঙ্গে, একটু ভিজতে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। জামাকাপড়, জুতোর দোকানে সব সাজানো রয়েছে দেখা যাচ্ছে কাচ দিয়ে, যদিও দোকান বন্ধ। বিখ্যাত সুইস ব্যাঙ্কের এ টি এম ও দেখা হল। এবারে ভেতরে যাই । বেশ ঠান্ডা লাগছে। নীলাঞ্জনা বলল।

ভেতরে গিয়ে কফি খেতে খেতে একটু গল্পগুজব হল। তারপরে ডিনার। চিকেন রয়েছে, কাজেই রূপকথা খুশি। সে চিকেন খেতে ভালোবাসে ।শেষে কাস্টার্ড খেয়ে বেশ ভালো লাগলো। এখানকার লোকজন মনে হল একটু চুপচাপ প্রকৃতির।

ঘরে গিয়ে হাল্কা কথাবার্তার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে সবাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম।

আল্পসের স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? বললাম নীলাঞ্জনাকে ।

হয়তো তাই। হাসিমুখে বলল সে।

ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে বেরোনো হল।

সুইজারল্যান্ড হল মধ্য ইউরোপের এক সুন্দর দেশ, যেখানে রয়েছে পর্বত, হ্রদ, মনোরম বাড়ি প্রভৃতি। এই দেশের রাজধানী হল বার্ন। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রধান শহরগুলি হল, জুরিখ, জেনেভা, লুসার্ন ,ব্যাসেল প্রভৃতি। এই দেশের প্রধান ভাষাগুলি হল জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, ও রোমানস। সংযোগকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর গুরুত্ব বেড়েছে। সুইস ফ্রাঁ হল এ দেশের টাকা। এই দেশ বিখ্যাত সুইস ওয়াচ, কাক্কু ক্লক ,চকোলেট, নয়নাভিরাম আল্পসের দৃশ্য, মনোরম হ্রদ, প্রভৃতির জন্য।

এই দেশ পৃথিবীর নিরাপদ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে অপরাধের হার খুবই কম।

এই দেশের বেশীর ভাগ মানুষই জার্মান। এছাড়াও রয়েছে ইতালিয়ান, ফ্রেন্চ , এবং অল্প সংখ্যক রোমানস। এখানকার জার্মান ভাষায় স্থানীয় টান আছে ,যাকে বলা হয় সুইস জার্মান। এখানকার আদি মানুষদের অধিকাংশই এসেছিল জার্মান মাইগ্রেশন অফ নেশনস এর সময়ে, যা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়কার, প্রায় চারশো খ্রীষ্টাব্দের সময়ে। সুইস কনফেডারেসি তৈরী হয় 1291 সালের পয়লা আগস্ট। সেইজন্য পয়লা আগস্ট এই দেশে ছুটি থাকে।

এই দেশ সর্বদা নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। এদের জীবনযাত্রা খুবই উন্নতমানের ।আর এখানেই রয়েছে বিখ্যাত সুইস ব্যাঙ্ক ।

বাস থামতে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। আমাদের গ্রুপে বেশ কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয় রয়েছেন, তাছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন বাঙালি ও অন্যান্যরা ।

মিঃ শ্রীনিবাসন বলে উঠলেন,

ওয়াণ্ডারফুল !

এক মায়াময় পরিবেশ। ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। কাছেই দেখা যাচ্ছে তুষারাবৃত আল্পস। বাতাসে তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। রূপকথার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেই তুষারকণা ধরছি হাত দিয়ে। হাতে সবারই গ্লাভস পরা। আমরা যাবো জুং ফ্রু তে, যাকে বলা হয় ,টপ অফ দ্য ইউরোপ ,অর্থাথ ইউরোপের সর্বোচ্চ স্থান। সবাই বেশ ভালো করে সোয়েটার, জ্যাকেট দিয়ে শরীর আবৃত করে রেখেছে।

এলিভেটরে করে ওপরে উঠছি। কাচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, চারদিকে খালি বরফ আর বরফ। নীচে দেখা যাচ্ছে পাইন গাছগুলোর ওপরে বরফ পড়ে সাদা হয়ে রয়েছে।

জুং ফ্রু সুইজারল্যান্ডের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জুং ফ্রু রেলওয়েজ ও রেলওয়ে স্টেশন ও আছে।

খানিক পরে ওপরে এসে পৌঁছলাম। এ যেন এক তুষারসাম্রাজ্য ।এক জায়গায় বরফ দিয়ে তুষারমানব বানানো হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল নীলাঞ্জনা।

রূপকথা বরফ হাতে নিয়ে ছুঁড়ল আমাদের দিকে। এবারে কেবল কারে চড়ে যাওয়া হল। এক রোমানঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একটা বেঞ্চের মত জায়গার ওপরে বসে আছি তিনজনে। সামনে খোলা। সেটা চলছে, আর নীচে বরফ।

রূপকথাকে বললাম, ভয় করছে?

মোটেই না, দারুণ লাগছে।

ও মাঝখানে বসেছে আর আমরা দুজন দুদিক থেকে ওকে ধরে আছি।

অবশেষে কেবল কার এক জায়গায় পৌঁছল। আমরা আরো একটু ঘুরলাম বরফের ওপরে। আরো ছবি তোলা হল। গ্রুপের কয়েকজনই এসেছে এখানে।

আরো যাওয়ার আছে। বললেন মিঃ পান্ডে ।

হ্যাঁ, জানি। বললাম আমি।

রূপকথা, কত বরফ দেখবে দেখে নাও। বললেন সুনির্মলবাবু ।তিনি এবং তাঁর বাড়ির সবাই আমার রুগী।

আমরা রোটাং পাসেও বরফ দেখেছি, কিন্তু এখানে তো বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সব ঠিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই শুরু হয়ে গেল তুষারঝড় বা ব্লিজার্ড । পরিস্থিতি বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ওপারে। কেবল কার আসতেই চড়ে বসলাম। গায়ে বরফের কণা এসে লাগছে। রূপকথা শক্ত হয়ে বসে আছে। এবারে একটু ভয় পেয়েছে ।

ক্রমশ তীব্রতা বাড়ছে তুষারঝড়ের ।যাই হোক, নিরাপদে ফিরে এলাম এপারে।

বাব্বা ,হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ! বলে উঠলো নীলাঞ্জনা।

মনে রাখার মতো এক অভিজ্ঞতা।

আমি তো মোটেই ভয় পাই নি। রূপকথা এতক্ষণে স্বরূপে ফিরেছে।

তাই বুঝি! বললাম আমি।

কি ভয় যে পেয়েছিলাম ! বললেন মিসেস কৃষ্ণমূর্তি।

একটা ঘরে সবাই হাত পা গরম করে নিচ্ছিল। আমাদের দরকার হল না।

আরো দেখার ছিল। কিন্তু কি আর করা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বললেন মিঃ শর্মা ।

তবুও তো ভালো যে এটা আগে শুরু হয় নি, তাহলে তো পুরোটাই মাটি হয়ে যেত। বললেন সুদীপ্তবাবু ,সুনির্মলবাবুর ছেলে।

তা ঠিক।

খানিক বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া করে নিয়ে সবাই রওনা দিলাম লুসার্নের দিকে। রাস্তার ধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ।

লুসার্ন খুব সুন্দর শহর। এখানকার ঘড়ি বিখ্যাত। আমরা কিনলাম রিস্টওয়াচ আর কাক্কু ক্লক । কাক্কু ক্লক তো খুবই বিখ্যাত।

খানিক ঘোরাফেরা হল। কফি খাওয়া হল। তারপর ফেরা হোটেলের উদ্দেশ্যে।

এ জায়গাটাও খুব সুন্দর। রূপকথা বলল।

হোটেলে ফিরে কথাবার্তা, গল্পগুজব হল খানিকক্ষণ। সবারই খুব ভালো লেগেছে সুইজারল্যান্ড। পিয়ানো বাজানো শুনলাম। তারপর ডিনার সেরে নেওয়া হল ।

কাল যাওয়া হবে ইতালির দিকে । দেখা হবে নতুন জায়গা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ইতালির দিকে, সুইজারল্যান্ডের মধুর স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে।

আবার আসব, এখানে, যদি পারি । নীলাঞ্জনা বলল।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১২

কম উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে না আই পি এল

শঙ্খশুভ্র ঘোষ

হইহই করে চলছে আই পি এল। যেখানে জমায়েত সেখানেই দেখছি কথা উঠলেই লোকে এবারের আই পি এল নিয়ে উত্তেজিত। উদগ্রীব। কিন্তু প্রশ্ন একটাই : এবারের আই পি এল-এ এখনো পর্যন্ত চমক বলতে কিছু/কেউ আছে কি ?

বাংলাস্ট্রিট-এর তরফে এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে যে উত্তরগুলো পেয়েছি তা-ই নিয়েই এবারের প্রতিবেদন। এই কদিনের মধ্যে যাঁরা সত্যিই দর্শক মহলে উত্তেজনা টানটান রেখেছেন তিনি অবশ্যই রিয়াগ পরাগ। রাজস্থান টিমের অন্যতম বল বলুন বা ভরসা পরাগের সম্পর্কে সবথেকে আলোচ্য বিষয় তাঁর অনমনীয় ব্যাটিং। এবারে তাঁকে খেলায় পাওয়া যাচ্ছে রীতিমতো পরিণত হিসেবেই। স্বভাবতই ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর এখনই

অরেঞ্জ ক্যাপের দাবিদার এই ওপর আছে তো বটেই, থাকতেও বাধ্য। অন্যদিকে এবারের আই পি এল-এ এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন পর্যন্ত সবচেয়ে দ্রুতগতির ডেলিভারি করেছেন মায়াঙ্ক যাদব। সেই সঙ্গে হিসেব মতো দুই ম্যাচে ছয় উইকেট।

ক্রীড়ামোদী তথা ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা যুক্তিসিদ্ধ ভাবে পাগল তাঁদের মত মানলে বলতে হয় যে, এই ধারাবাহিকতা যদি বজায় রাখতে পারেন তাহলে আগামী জুনে বিশ্বকাপ টিমে মায়াঙ্ক যাদব অবশ্যই একটি নিশ্চিত নামের দাবিদার। দেশের এই নতুন পেস সেনসেশনকে নিয়ে নানান জোর খবরের মধ্যে অন্যতম হল , মায়াঙ্কের ডায়েট চার্ট । ডাল আর রুটি খেয়েই রীতিমতো প্রতিপক্ষের যম হয়ে উঠেছেন তিনি। পাশাপাশি কলকাতার হর্ষিত রানা নামটি উঠে আসছে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে ক্লাসেনদের থামিয়ে দিয়ে। নাইটদের ডেথ ওভারের অন্যতম স্পেশালিস্ট হিসেবে এই পেসারকে নজরে রাখতে বাধ্য ক্রীড়ামোদীরা।

এবারের আই পি এল-এ অন্যতম সেরা চমক বলতে দিল্লির ঋষভ পন্থের ৪৫৩ দিন বাদে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে এসে লিগ তালিকায় রীতমতো বলে বলে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চার নম্বরে উঠে আসায়। পন্থের স্ট্রাইক রেট ১৫৮. ৩৩। এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে কোনো সন্দেহ নেই পন্থকে বিশ্বকাপ টিমে না রাখার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছেন না ক্রিকেট প্রাণ দর্শককুল। অপেনার হিসেব এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ১৩৪ রান করে নজরে আছেন অবশ্যই কলকাতা দলের সুনীল নারিন। তাঁর স্ট্রাইক রেটও রোমাঞ্চকর ২০৬.১৫। স্বভাবতই তাঁকে শুরুতে পাঠানো নাইট দলের অন্যতম মাস্টারস্ট্রোক। হায়দারাবাদের তরফে অন্য ব্রান্ডের খেলে গোড়া থেকেই নজর কেড়েছেন ক্লাসেন। হেনরি ক্লাসেনের স্ট্রাইক রেটও কম রোমাঞ্চকর নয়। ২১৯.৭৩।

‘অতি উত্তম হইল

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

উত্তমকে ঘিরে এক স্মৃতির ভ্রমণ। আর উত্তম মানে সিওর-শট বক্সঅফিস হিট। আর এটা হিসেব করেই ‘অতি উত্তম’ । উত্তমকুমারের জীবন নয়, উত্তমকে ফিরিয়ে আনা। ‘এ আই’ নয় টালিগঞ্জে পাতি কারিগরি দিয়ে। ফলে ব্যাপারটা নয়, বরং আইডিয়াটা ঝুলেছে। দুটো বাস্তব চরিত্রের মধ্যে উত্তমের পুরোনো সব ছবি থেকে কেটে কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ‘অতি উত্তম’ চলে গেছে সিনেমা জন্মাবার প্রাক-যুগে।এটা পেরেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। প্রায় ১২৫ বছর পেছিয়ে দিয়েছেন সিনেমাকে। তবে হাঁ,ফাস্ট অ্যাটেম্পট ! আর শুধুমাত্র সেই অর্থে ‘ভারতে প্রথম’ হিসেবে একটা ক্রেডিট দেওয়া যেতেই পারে। আর সেই ভবনা থেকে ছবিটা দেখা এক অন্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু দেখতে বসে নানান উত্তমে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়বেন দর্শক। উদভ্রান্তও। নানা বয়সের নানা সময়ের নানা উত্তমকে কেটেকুটে নিয়ে আসা হয়েছে। আর যে সব ছবি থেকে কাটা হয়েছে তাদের অবস্থা যেহেতু খুবই খারাপ, ফলে যা হবার তাই হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি,ভারতে হয়ত এই প্রথম, কিন্তু হলিউডে এই প্রক্রিয়ায় নায়কের প্রত্যাবর্তন নিয়ে কাজ হলিউডে আগেই করে ফেলেছেন উডি অ্যালেন। সেই ছবির সঙ্গে এই ‘অতি উত্তম’ ছবির গল্পের আউটলাইনের আবার বেশ মিল। কে জানে, কাকতালীয় বোধহয়।

আর গল্প? ‘অতি উত্তম’ -এ আছে হয়ত। কৃষ্ণেন্দু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উত্তম কুমারকে নিয়ে পিএইচডি করছে। তার গুরু মহানায়ক উত্তমকুমার। কৃষ্ণেন্দুর আবার এক প্রেমিকা আছে। সোহিনী। সোহিনী উত্তর হলে কৃষ্ণেন্দু দক্ষিণ।কৃষ্ণেন্দু চায় সোহিনী রিনা ব্রাউন হোক।মানে পুরো সপ্তপদী। কিন্তু এসবকে পাত্তা দেয় না সোহিনী। এমন সময় প্ল্যানচেটে হাজির লাভগুরু উত্তমকুমার। সে-ই ক্রমে ব্রিজ হয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দু -সোহিনীর প্রেমে।

এই নিয়েই ‘অতি উত্তম’ । গ্রামের মেলার যাদু টোনা।

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

১০এর আড্ডার বসন্ত উৎসব

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার '১০এর আড্ডা'-র পক্ষ থেকে শোভাবাজার রাজবাড়িতে পালিত হল বসন্ত উৎসব। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, কলকাতার উপমহানাগরিক ও বিধায়ক অতীন ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলর ও সংস্থার সভাপতি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। প্রস্মিতা পাল-র অনবদ্য সঙ্গীত খুবই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলার জন্য উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান সংস্থা সম্পাদক শুভাশীস চক্রবর্তী।

মহিলা ভূমিহার সমাজের আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হোলি উৎসব

সম্প্রতি কলকাতার মহিলা ভূমিহার সমাজের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কলকাতার লেক মল-এর পাশে সেকেন্ড হাউজ হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হোলি উৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই মিলন অনুষ্ঠানে ভূমিহার সম্প্রদায়ের মহিলারা নারীর

স্বাধিকার রক্ষায় সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি ছিল উপস্থিত সদস্যাদের মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং হোলি উৎসবের মধ্য দিয়ে আগামীদিনে এক সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নারী শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বার্তা।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি পৌরসভার কাউন্সিলর নির্মলা রাই, ডাঃ প্রীতি, সোনি সিং, রেণু, প্রিয়া, স্বেতা সহ ভূমিহার মহিলা সমাজের সাথে যুক্ত বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য-র জন্য উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে সরোজ সিং এবং শ্বেতা সিংকে অভিনন্দিত করা হয়।

প্রকাশিত হল দেবাংশ দেওরার 'টোয়েন্টি শেপস অফ ইউরোপ'

সম্প্রতি বিশ্ব কবিতা দিবসের আলোঝলমলে সন্ধ্যায় কলকাতার সাউথ সিটি মলের স্টারমার্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল দেবাংশ দেওরার ইউরোপনামা 'টোয়েন্টি শেপস অফ ইউরোপ'। ডন বস্কো স্কুলের ছাত্র দেবাংশ এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন ইউরোপের কুড়িটি কিংবদন্তী স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে রচিত কুড়িটি মনোগ্রাহী ছবি, কবিতা, একটুকরো ইতিহাস এবং স্থাপত্যের খুঁটিনাটি। এক্সেলার বুকস আয়োজিত এই বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রপরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখিকা সুলগ্না মুখোপাধ্যায় এবং সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপিকা চন্দ্রাণী বিশ্বাস। বইটির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ছিল বই নিয়ে এক মনোগ্রাহী

আলোচনাসভা। আলোচনা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি বৈশালী চ্যাটার্জী দত্ত। কবিতার বিভিন্ন আধুনিক ধারা এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থাপত্য নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ হন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে, লেখক এবং অতিথিরা বই থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন